গবেষণা সিরিজ-৮

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S(Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮, মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
Web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০০১
৪র্থ সংস্করণ : জুন ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

কিউ আর এফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২৮.০০ টাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মজীদ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন মজীদ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মজীদ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মজীদ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মজীদ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِه

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ : ২২, নিসাঃ ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি

বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিহাহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৮.০৯.২০০০ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষ করে গবেষণা বিভাগের শওকত আলী জাওহার নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন—এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা

সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْاَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থঃ রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললোঃ হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لَا يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে

সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

   (বুখারী ও মুসলিম)

   হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

   (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্ত
নভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর সূরা বনী ইসরাইলে বর্ণিত ইসরা বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ

তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।
বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

মূল বিষয়

ইসলামী জীবন বিধানে পরিভাষাগতভাবে ফরজ বলা হয় অবশ্য করণীয় বিষয়গুলোকে। হারাম বলা হয় অবশ্য বর্জনীয় (নিষিদ্ধ) বিষয়গুলোকে। নফল বলা হয় ফরজের বাইরের বা অতিরিক্ত করণীয় বিষয়গুলোকে। আর মাকরুহ বলা হয় হারামের বাইরের বা অতিরিক্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে।

ফরজ ও হারাম বিষয়গুলোকে অবশ্য করণীয় ও অবশ্য বর্জনীয় (নিষিদ্ধ) বলা হয় এ কারণে যে, সেগুলোর একটিও যথাক্রমে বাদ দিলে বা পালন করলে যে কর্মকান্ডের সাথে বিষয়টি জড়িত তা আংশিক নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। যেমন, সালাতের ফরজ আরকান (বিষয়) বলা হয় সে বিষয়গুলোকে যার একটিও বাদ গেলে সালাত আংশিক নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তাই, ফরজ ও হারাম বিষয় হলো ইসলামের মৌলিক করণীয় ও বর্জনীয় (নিষিদ্ধ) বিষয়। কারণ কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়গুলোকে মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় বলা হয় যার একটিও যথাক্রমে বাদ দিলে বা পালন করলে যে কর্মকান্ডের সাথে বিষয়টি জড়িত তা আংশিক নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে নফল হলো সেই করণীয় বিষয়গুলো যার সবকটিও পালন না করলে যে কর্মকান্ডের সাথে বিষয়গুলো জড়িত তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে যায়। যেমন, সালাতের নফল আরকান বলা হয় সে বিষয়গুলোকে যার সবকটিও বাদ গেলে সালাত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় না, তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা রয়ে যায়। আর মাকরুহ বলা হয় সেই নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে যার সবকটিও পালন করলে যে কর্মকান্ডের সাথে বিষয়গুলো জড়িত তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু খুঁত রয়ে যায়। তাই, নফল ও মাকরুহ বিষয়গুলো হলো ইসলামের অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়। কারণ কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়গুলোকে অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় বলা হয় যার সবকটিও যথাক্রমে বাদ দিলে বা পালন করলে যে কর্মকান্ডের সাথে বিষয়টি জড়িত তা পুরোপুরি ব্যর্থ হয় না, তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা বা খুঁত রয়ে যায়।

আদমশুমারি অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ১৫০ কোটি। এদের মধ্যে যারা মোটামুটিভাবে ইসলামী জীবন বিধানের নিষ্ঠাবান অনুসারী, তাদেরও ইসলামের অনুসরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-

- ❑ অধিকাংশই অনেক ফরজ (মৌলিক করণীয়) বিষয় বাদ দিচ্ছেন বা হারাম (মৌলিক নিষিদ্ধ) কাজ পালন করছেন,
- ❑ অনেকেই বহু নফল ও মাকরুহ বিষয়কে মৌলিক মনে করে নিষ্ঠার সাথে পালন বা বর্জন করছেন,
- ❑ অধিকাংশের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুন্নাহ বাদ যাচ্ছে,
- ❑ আবার অনেকে কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সাথে আমল করে যাচ্ছেন।

সাধারণ জ্ঞানেই বলা যায়, যে কোন কর্মকাণ্ড উপরোক্তভাবে পালিত হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং যারা ঐভাবে তা পালন করছেন, তারা ঐ কর্মকাণ্ডের সকল কল্যাণ হতে বঞ্চিত হবেন। মুসলমানদের বর্তমান দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মুসলমানের উপরোক্তভাবে ইসলাম পালন করা। আবার এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ ভাবে ইসলামী জীবন বিধানকে অনুসরণ করছেন, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ইসলামের সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

মুসলমানদের আমলের এই বিপর্যয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে- তাদের অধিকাংশই জানেন না, কোনগুলো ইসলামের ফরজ, নফল, হারাম ও মাকরুহ অর্থাৎ মৌলিক ও অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় এবং কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ আর কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। আর এই অজানা থাকারও একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, এমন কিছু তথ্য পরিষ্কার না থাকা, যা দ্বারা ঐ বিষয়গুলো সহজে বুঝা বা নির্ণয় করা যায় ।

তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের এমন কিছু তথ্য জানিয়ে দেয়া যাতে তারা সহজে জানতে, বুঝতে বা বের করতে পারে, ইসলামের কোন্ কাজগুলো ফরজ ও হারাম এবং কোন কাজ গুলো নফল

ও মাকরুহ। আর কোনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ ও কোনগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এটা তাদের ইসলাম অনুসরণের পদ্ধতিকে শুধরিয়ে নিতে অর্থাৎ মৌলিক আমলগুলোর একটিও বাদ রেখে অমৌলিক আমল পালন থেকে দূরে থাকতে দারুণভাবে সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। আর এর ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গুরুত্ব অনুযায়ী ইসলামের বিষয়গুলোর শ্রেণীবিভাগ

চলুন কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে বিষয়টি জানা যাক-

বিবেক-বুদ্ধি

কোন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়কে গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়**

এ হচ্ছে সে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় যার একটিও যথাক্রমে বাদ দিলে বা পালন করলে কর্মকাণ্ডটি প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়।

২. **দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়**

এগুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। করণীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে এর একটিও বাদ গেলে, সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলে মূল কর্মকাণ্ডটিও সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়। তাই এ ব্যর্থতাটি হয় পরোক্ষভাবে।

আর নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে সেটি হবে এমন বিষয় যার প্রতিটি বাস্তবায়িত হলেই শুধু তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়। ফলস্বরুপ মূল কর্মকাণ্ডটি সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হয়। তাই এ ব্যর্থতাটিও হয় পরোক্ষভাবে।

৩. **অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়**

এ বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো যার সবকটিও যথাক্রমে বাদ গেলে বা পালন করলে মূল কর্মকাণ্ডটি ব্যর্থ হবে না। তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিভাষাগত দিক দিয়ে ইসলামে মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়কে যথাক্রমে ফরজ ও হারাম বিষয় এবং অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে যথাক্রমে নফল ও মাকরুহ বিষয় বলা হয়। তাই, বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় গুরুত্ব অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত হবে। যথা-

১. **প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় তথা প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়**

এগুলো হবে সে বিষয় যার একটিও যথক্রমে বাদ গেলে বা পালন করলে মুসলিমের জীবন প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে।

২. **দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় তথা দ্বিতীয় স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়**

এগুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। ফরজ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে এর একটিও বাদ গেলে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের ফরজ বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলে একজন মুসলমানের জীবন আবার সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে। তবে এ ব্যর্থতা হবে পরোক্ষ।

আর নিষিদ্ধ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে সেটি হবে এমন বিষয় যার প্রতিটি বাস্তবায়িত হলেই শুধু তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়। ফলে একজন মুসলমানের জীবন আবার সম্পূর্ণ (১০০%) ব্যর্থ হবে। তাই এ ব্যর্থতাটিও হয় পরোক্ষভাবে।

৩. **অমৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় তথা নফল ও মাকরুহ বিষয়**

এগুলো হবে সে বিষয় যার সবকটিও যথাক্রমে বাদ গেলে বা পালন করলে কোন মুসলমানের জীবন ব্যর্থ হবে না, তবে তাতে কিছু খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

ইসলামের প্রথম স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয় জানা বা বুঝার সহজতম উপায়

আল-কুরআন

তথ্য-১

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط

অর্থ: তোমরা কি কিতাবের (আল্লাহর কিতাবের) কিছু মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যারা ঐ রকম করবে, দুনিয়ার জীবনে তাদের বদলা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর পরকালে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিন শাস্তির দিকে। (বাকারা /২ :৮৫)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু মানবে আর কিছু মানবে না, দুনিয়ার জীবনে তাদের শুধু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। আর পরকালে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ তাদের ইহকালীন এবং পরকালীন উভয় জীবনটাই প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ط

অর্থ: হিদায়াত সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর যারা তা হতে ফিরে যায়, তাদের জন্যে শয়তান ঐরূপ আচরণকে সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা তাদের জন্যে দীর্ঘ করে দিয়েছে। এটা এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর নাযিল করা বিষয়কে (কিতাব বা দ্বীনকে)

অস্বীকারকারীদের বলে, কোন কোন বিষয়ে আমরা তোমাদের অনুসরণ করব। আল্লাহ তাদের গোপন কথা ভালো করেই জানেন। তাহলে তখন কি হবে যখন ফেরেশতাগণ তাদের রুহগুলোকে কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর মারতে থাকবে। এটাতো এ কারণেই যে, তারা আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তার সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করাকে অপছন্দ করেছে। এ কারণে তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দিবেন। (মুহাম্মাদ/৪৭: ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হিদায়াত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে- জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াতটিতে যা বলা হয়েছে তা হল-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

এ আয়াতটির তথ্যগুলো থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

❑❑ আল-কুরআনের উপরের দুটো তথ্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল-কুরআনের কিছু মানলে বা অনুসরণ

করলে এবং কিছু না মানলে বা অনুসরণ না করলে মানুষের পুরো জীবনটাই প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হবে। তাহলে মৌলিক, ফরজ ও হারাম বিষয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী এটা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, কুরআন অনুযায়ী, আল-কুরআনের ঐ বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা ফরজ ও হারাম বিষয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কিছু বলতে আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন। কিছু বলতে তিনি কি কুরআনে আলোচনাকৃত সকল কথার কিছু বুঝিয়েছেন, না তিনি কুরআনের মূল বিষয়গুলোর কিছু বুঝিয়েছেন। ব্যাপারটি বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো জানা ও বুঝা দরকার-

তথ্য-১

আল-কুরআনের আলোচিত বিষয়গুলোকে যে সকল ভাগে ভাগ করা যায়, তা হচ্ছে-

১. মূল বিষয়

- কুরআনের জ্ঞান অর্জন
- তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান
- রাসূলের অনুসরণ
- দীনকে বিজয়ী করা
- ব্যবসা-বাণিজ্য
- সুদ
- লেনদেন
- জিনা ও তার শাস্তি
- চুরির শাস্তি
- টাকা-পয়সা খরচ
- দান-ছদাকা
- নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত
- জীবনের সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন
- পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য
- পারস্পরিক আচার-ব্যবহার
- দাওয়াত
- যুদ্ধ-সন্ধি
- এতিমের দেখাশোনা
- বিবাহ, তালাক
- সম্পদ বণ্টন
- ওজু, গোসল
- নামাজের আগে ওজু-গোসল
- বিবেক-বুদ্ধি ইত্যাদি।

এই মূল বিষয়গুলো হচ্ছে সে বিষয়গুলো, যা মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে সফলকাম হওয়ার জন্যে অপরিহার্য।

২. মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যাকারী বিভিন্ন বক্তব্য আল-কুরআনে আছে। তাই মনীষীরা এ ব্যাপারে একমত যে, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে আল-কুরআন। তবে কুরআনের সকল মূল বিষয় শুধু কুরআন দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। হাদীসের সাহায্য সেখানে অপরিহার্য।

৩. উদাহরণ ও কাহিনী সম্বলিত বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো বুঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে আল-কুরআনে অনেক উদাহরণ (আমছাল) ও কাহিনী (কেচ্ছা) বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে এই উদাহরণ ও কাহিনীর আয়াত।

৪. আরকান-আহকাম তথা মূল বিষয়গুলোর বাস্তবায়নের নিয়ম-কানুন সম্বলিত বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো বাস্তবায়নের আরকান-আহকাম বা নিয়ম-কানুন সম্বলিত অনেক বক্তব্য কুরআনে উল্লেখ আছে। তবে সকল আরকান-আহকাম কুরআনে নেই। রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাহের মাধ্যমে বাকিগুলোসহ সবগুলো জানিয়ে দিয়েছেন। আরকান-আহকামগুলোর কিছু মৌলিক আর কিছু অমৌলিক।

৫. উৎসাহ নিরুৎসাহ প্রদানমূলক বক্তব্য

মূল বিষয়গুলো পালনকে উৎসাহিত করার জন্যে এবং তা পালন থেকে বিরত থাকাকে নিরুৎসাহিত করার জন্যে পুরস্কার বা শাস্তির ঘোষণামূলক অনেক বক্তব্যও আল-কুরআনে আছে।

৬. মূল বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের (Options) বর্ণনা

যেমন-

ক. সূরা বাকারার ২৭১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْط

অর্থঃ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তাতে কল্যাণ আছে কিন্তু যদি তা গোপনে ফকিরকে দাও তবে তা আরো ভালো।

ব্যাখ্যাঃ এখানে দান প্রকাশ্যে বা গোপনে দেয়া উভয় পদ্ধতিকেই আল্লাহ অনুমোদন দিয়েছেন। তবে গোপনে দেয়াকে বেশি ভালো বলেছেন।

খ. সূরা শুরার ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهط

অর্থঃ যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। তবে যে ক্ষমা ও আপোস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে।

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে অত্যাচারিত বা আক্রান্ত হলে কী করণীয়, সে ব্যাপারে দুটো উপায়ের কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে আক্রমণের অনুরূপ বা সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমা এবং আপোস করা। অর্থাৎ আক্রান্ত হলে এ দুটি উপায়ের কোন একটি, অবস্থা অনুযায়ী যে কেউ গ্রহণ করতে পারে।

৭. মূল বিষয়ের নফল (অমৌলিক) দিক

সূরা বনী-ইসরাইলের ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَط-

অর্থঃ আর রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ পড়। এটি তোমার জন্যে নফল।

ব্যাখ্যাঃ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, তাহাজ্জুদের নামাজ নফল। অর্থাৎ পড়লে সওয়াব (ছোট ওজরের কারণে) না

পড়লে মানুষের জন্যে গুনাহ নেই। অর্থাৎ এটি ইসলামের একটি অমৌলিক বিষয়।

❑❑ আল-কুরআনে আলোচিত বিষয়গুলোর সম্বন্ধে উপরের তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, কিছু মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আল-কুরআনের সকল বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে এবং কুরআনে ইসলামের অমৌলিক বিষয়েরও উল্লেখ আছে। কুরআনের ঐ মূল বিষয়গুলো হচ্ছে এমন সব বিষয় যা মানুষের দুনিয়ার জীবন সুশৃঙ্খল, শান্তিময়, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে সফল হওয়ার জন্যে সরাসরিভাবে অপরিহার্য। তাই সহজেই বুঝা যায়, সূরা বাকারার ৮৫ নং এবং সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতে আল্লাহ যে বলেছেন, কুরআনের কিছু মানলে আর কিছু না মানলে অথবা কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবনটা প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হবে, সেখানে তিনি ঐ মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর কথাই বলেছেন। অর্থাৎ ঐ গুলোই হবে ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় তথা প্রথম স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয়।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক ব্যক্তি নামাজ ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি (রাসূল সা.) বললেন,

সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোজা রাখে, সদকা কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হল পনিরের টুকরোবিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী। (আহমদ, বায়হাকী,মিশকাত শরীফ- হাদীস নং-৪৭৭৫)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিবেশী বা কাউকে মুখ তথা কথার মাধ্যমে কষ্ট না দেয়া কুরআনের একটি মূল করণীয় বিষয়। আর কষ্ট দেয়া একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। হাদীসখানির মাধ্যমে স্পষ্ট জানা ও বুঝা যায়, ঐ একটি নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে প্রথম মহিলাকে দোযখে যেতে হবে। অর্থাৎ তার অন্য সকল আমল সরাসরি ব্যর্থ ধরা হবে। তাই হাদীসখানি থেকে সহজে বুঝা যায়, আল-কুরআনের প্রতিটি মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় ইসলামের একটি প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ তথা প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়।

তথ্য-২

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِيْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَى جَنْبِهِ. رواه البيهقى فى شعب الايمان.

অর্থঃ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয় যে উদর ভরে খায় কিন্তু পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

(বায়হাকী,শো'আবুল ঈমান, মিশকাত শরীফ– হাদীস নং ঃ ৪৭৭৪)

ব্যাখ্যাঃ প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে অর্থাৎ তাদের খাদ্য পাওয়ার বিষয়ে কোন ধরনের ভূমিকা না রেখে নিজে পেট ভরে খাওয়া কুরআনের একটি মূল নিষিদ্ধ বিষয়। ঐ ধরনের কর্মপদ্ধতি যে অনুসরণ করবে, আলোচ্য হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) তাকে ঈমানদার নয় তথা কাফির বা মুনাফিক বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ ধরনের কর্মপদ্ধতির জন্যে একজনের জীবনের অন্য সকল কর্মকাণ্ডকে সরাসরি ব্যর্থ ধরা হবে। তাই

এ হাদীসখানি থেকেও বুঝা যায়, আল-কুরআনের মূল নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক নিষিদ্ধ তথা প্রথম স্তরের হারাম বিষয়।

তথ্য-৩

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلَى جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَ كَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَّمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ .

অর্থ: জাবের (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল (আ.) কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক শহরকে তার অধিবাসী সহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব, তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্ত্তের জন্যেও তোমার নাফরমানী করে নাই। রাসূল (সা.) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তার ও তাদের সকলের উপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার হতে দেখে মুহূর্ত্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন হয় নাই।

(বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত শরীফ– হাদীস নং ঃ ৪৯২৫)

ব্যাখ্যাঃ পাপাচার প্রতিরোধ করা কুরআনের একটি মূল করণীয় বিষয়। এই একটি কাজ পালন না করার জন্যে হাদীসটিতে উল্লিখিত ব্যক্তিটির অন্য সকল আমল সরাসরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই এ হাদীসখানি থেকেও নিঃসন্দেহে জানা ও বুঝা যায় কুরআন মজীদে উল্লেখিত প্রতিটি মূল করণীয় বিষয়ই ইসলামী জিন্দেগীর প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় তথা প্রথম স্তরের ফরজ বিষয়।

□□ হাদীস গ্রন্থে এ ধরনের অসংখ্য হাদীস আছে, যেখান থেকে স্পষ্টভাবে জানা ও বুঝা যায় আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলোর প্রত্যেকটিই ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়। অর্থাৎ যে বিষয়ের মাত্র একটিও পালন না করলে মানুষের জীবন প্রত্যক্ষ ভাবে ১০০% ব্যর্থ হবে।

□□কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত তথ্যসমূহ হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় আল-কুরআনের মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় তথা প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়।

আল-কুরআনে উল্লেখ নেই এমন বিষয় ইসলামের প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় হবে কিনা?

পরবর্তী যে প্রশ্ন সাধারণভাবে এসে যায় তা হচ্ছে, কুরআনে উল্লেখ নেই এমন কোন প্রথম স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয় ইসলামে আছে কিনা? বিষয়টি বুঝতে হলে নিম্নের তথ্যগুলো জানা দরকার।

ক. বিবেক-বুদ্ধি

ইসলামকে জানা ও বুঝার আল্লাহ প্রদত্ত মাধ্যমগুলো (গুরুত্ব অনুযায়ী) হচ্ছে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। এর মধ্যে কুরআন হচ্ছে স্বাধীন এবং নির্ভুল। হাদীস হচ্ছে কুরআনের অধীন। আর বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে কুরআন ও হাদীসের অধীন। কুরআনের বক্তব্য লিখে রেখে এবং মুখস্থ করে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে তা নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর সূরা আল-হিজরের ৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের একটি অক্ষরও যাতে কেউ কিয়ামত পর্যন্ত বদলাতে না পারে, সে দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। অন্যদিকে কুরআন নাযিল হওয়ার প্রথমদিকে রাসূল (সা.) হাদীস লিখতে নিরুৎসাহিত করেছেন এবং তা প্রকৃতভাবে সংকলন শুরু হয়েছে রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ২০০-২৫০ বছর পর। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের কয়েক প্রজন্মের (Generation) পর। আর বিবেক কোন ব্যাপারে মানুষের অন্তরে

শুধু ইঙ্গিত দেয়, নিশ্চয়তা দেয় না। তাছাড়া বিবেক শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিতও হয়।

তাই এ কথা সহজেই বলা যায় যে, যে বিষয়গুলোর মাত্র একটিও না মানলে বা ইচ্ছা করে অনুসরণ না করলে মানুষের পুরো জীবনটা সরাসরি বিফলে যাবে (অর্থাৎ জীবনের মূল মৌলিক তথা মূল ফরজ ও হারাম বিষয়) ঐ বিষয়গুলোর একটিও কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে নির্ভুলভাবে না জানিয়ে হাদীস বা বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন বলে মনে হয় না।

খ. আল-কুরআন

চলুন এখন দেখা যাক আল-কুরআনে এ ব্যাপারে কী কী তথ্য আছে-

তথ্য-১

সূরা নাহালের ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: আর তোমার ওপর যে কিতাব (আল-কুরআন) নাযিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন, আল-কুরআনে আছে মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের বর্ণনা।

তথ্য-২

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ

الإِسْلَامَ دِيْنًا ط

অর্থ: আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দীন হিসাবে মনোনীত করা হল। (মায়েদা /৫ : ৩)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতটির পর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এ আয়াত নাযিলের পর রাসূল (সা.) মাত্র ৮১ দিন জীবিত ছিলেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, ইসলামের বিধি-বিধান এই আয়াতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

□□ এ দুখানি আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের সকল বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের ফরজ বিষয়গুলোর (প্রথমস্তরের ফরজ বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির ফরজ বিষয়) সবগুলো কুরআনে নেই। আর নফল (অমৌলিক) বিষয় আছে খুবই কম।

তাই সহজেই বলা যায় এ দুখানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ইসলামের সকল প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে বিষয় কুরআনে উল্লেখ নাই সেটি ইসলামের প্রথমস্তরের ফরজ বা হারাম বিষ। নয়।

ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় জানা বা বুঝার সহজতম উপায়

ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় হলো প্রথমস্তরের ফরজ ও হারাম বিষযগুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো। এর কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে সুন্নাহ বা হাদীসে। দ্বিতীয়স্তরের ফরজ বিষয়গুলোর একটিও বাদ গেলে বা হারাম বিষয়গুলো পালন করলে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রথমস্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। ফলস্বরুপ আবার মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হয়। তাই শুধু হাদীসের মাধ্যমে ২য় স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে সে হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী তথা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হতে হবে এবং তার বক্তব্য কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।

ইসলামের নফল ও মাকরুহ বিষয় নির্ণয়ের সহজতম উপায়

ইসলামের নফল ও মাকরুহ বিষয় হলো সেগুলো যার সবকটিও যথাক্রমে বাদ গেলে বা পালন করলে মানুষের জীবন ব্যর্থ হবে না তবে তাতে কিছু খুঁৎ বা অসম্পূর্ণতা রয়ে যাবে। এর খুব কমই কুরআনে উল্লেখ আছে। তবে এর সবগুলো উল্লেখ আছে রাসূল (সা.) এর হাদীসে। কোন বিষয় ইসলামের নফল বা মাকরুহ বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা

অবশ্যই রাসূল (সাঃ) এর হাদীসে থাকতে হবে এবং তা কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হতে পারবে না। কুরআনে উল্লেখিত নফল বিষয়ের একটি হল তাহাজ্জুদের নামাজ।

ইসলামের ফরজ, নফল, হারাম ও মাকরুহ বিষয় নির্ণয়ের উদাহরণ

নামাজ কুরআনে উল্লেখিত একটি মূল বিষয়। তাই তা ইসলামের একটি প্রথম স্তরের ফরজ বিষয়। আর নামাজের আরকান-আহকামের মধ্যে যেগুলো মৌলিক তা হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয়স্তরের ফরজ বিষয়। এর কিছু আছে কুরআনে আর সবগুলো আছে হাদীসে। তবে নামাজের যে ফরজ আরকান-আহকাম শুধুমাত্র হাদীসের মাধ্যমে নির্ণিত হবে সে হাদীসগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ তথা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস হতে হবে।

নামাজ ইসলামের একটি করণীয় বিষয়, একথাটি যদি কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ না থাকত কিন্তু সুন্নাহে থাকত তবে নামাজ হত ইসলামের একটি অমৌলিক তথা নফল বিষয়।

সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ এটি আল-কুরআনের একটি মূল বক্তব্য। তাই সুদ ইসলামের একটি প্রথম স্তরের হারাম বিষয়। আর যে বিষয়গুলো না হলে সুদ খাওয়া বিষয়টি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় তা হবে ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের হারাম বিষয়। যেমন- সুদ দেয়া. নেয়া, লিখা ও সুদের সাক্ষ্য থাকা। এ দ্বিতীয় স্তরের হারাম হবে যদি এগুলো কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসে উল্লেখ থাকে। আর সুদের বিষয়টি যদি আল-কুরআনে কোনভাবেই উল্লেখ না থাকতো তবে সুদ হতো ইসলামের একটি অমৌলিক তথা মাকরুহ ধরনের নিষিদ্ধ বিষয়।

ফরজ, নফল, হারাম ও মাকরুহ বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যগুলোর সারসংক্ষেপ

উপরে উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে নিশ্চিতভাবে যে কথাগুলো বলা যায় তা হলো–

১. আল-কুরআনের মূল করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর সব কটিই ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয়।
২. আল-কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি এমন কোন বিষয় ইসলামের প্রথম স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয় হবে না।
৩. ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয়গুলোর কিছু আছে কুরআনে, আর সবগুলো আছে সুন্নাহে। কোন হাদীসের বক্তব্য ঐ রকম বিষয় হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে হলে সে হাদীসটিকে অবশ্যই সন্দেহমুক্ত অর্থাৎ মুতাওয়াতির সহীহ হতে হবে এবং তা কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরোধী হতে পারবে না।
৪. কুরআন ও সহীহ হাদীসের যে সকল বক্তব্য, কুরআনের কোন মূল বিষয় বা তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয় নয় অর্থাৎ ইসলামের প্রথম বা ২য় স্তরের ফরজ বা হারাম বিষয় নয়, তা হবে ইসলামের নফল বা মাকরুহ বিষয়। হাদীসের মাধ্যমে নির্ণিত নফল ও মাকরুহ বিষয়ের কোনটি কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হতে পারবে না।

রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ সম্বন্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

রাসূল (সা.) তাঁর নবুয়াতী জীবনে যা কিছু করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন তার নির্ভুলরূপ হল রাসূলের সুন্নাহ। যেমন-

ক. রাসূল (সা.) কুরআন বুঝে বুঝে পড়েছেন, কখনও না বুঝে পড়েননি, নামাজ কায়েম করেছেন, রোজা থেকেছেন, হজ্ব করেছেন। সুতরাং এগুলোর নির্ভুলরূপ হবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।
খ. রাসূল (সা.) জেহাদ করেছেন, রাষ্ট্র চালিয়েছেন, বিচার করে ধনী চোরের হাত কাটার ব্যবস্থা করেছেন, হত্যার বদলে হত্যার ব্যবস্থা করেছেন, ব্যভিচারের শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, সুদ বন্ধ করেছেন। সুতরাং এগুলো রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।
গ. তিনি সত্য বলেছেন, মিথ্যা বলেননি। পরোপকার করেছেন। ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করেছেন। তাই এগুলোও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ।

ঘ. রাসূল (সা.) বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন। পিতা, স্বামী, নানা ইত্যাদি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছেন। খাওয়া-দাওয়া করেছেন, ঘুমিয়েছেন, পেশাব-পায়খানা করেছেন। সুতরাং এরও নির্ভুলরূপ তাঁর সুন্নাহ।

ঙ. তিনি পোশাক পরেছেন, দাড়ি রেখেছেন, [illegible] কেটেছেন, চুল ছেঁটেছেন, জুতা পরেছেন-তাই এগুলোর নির্ভুলরূপও হবে তাঁর সুন্নাহ।

চ. উপরোল্লিখিত সকল কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তিনি যা কিছু করেছেন, বলেছেন ও সমর্থন করেছেন-তার সবগুলোর নির্ভুলরূপ হবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ ।

সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায়, রাসূল (সা.) এর ঐ সকল কথা, কাজ বা সমর্থন কোনভাবেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ তার কোনোটা অবশ্যই বেশি এবং কোনোটা কম গুরুত্বপূর্ণ হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এটা জানা বা বুঝার সহজ উপায় কী? আর এটা জানা ও বুঝা খুবই দরকার। কারণ তা না হলে মনের অজান্তেই রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের অনুসরণের সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বাদ পড়ে যাবে বা অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আগে আমল করা হয়ে যাবে। আর এর ফলে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের অনুসরণ করে অবশ্যই দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ পাওয়া যাবে না।

সুন্নাহ্ জানা ও বুঝার ব্যাপারে সাহাবায়েকেরামগণের অবস্থা

বিষয়টির ব্যাপারে বিখ্যাত মনীষী শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) এর 'আল ইনসাফ ফি বয়ানী আসবাবিল ইখতিলাফ' (মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়) নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে কিছু তথ্য একটু গুছিয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. রাসূল (সাঃ) এর সময়কালের অবস্থা

১. রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূল (সা.) যখন কোন আমল করতেন, সাহাবায়ে কেরাম তা দেখতেন। তারপর তাঁরা রাসূল (সা.) এর করা নিয়মে ঐ আমলটি

করতেন। সাধারণত এটাই ছিল রাসূল (সা.) এর শিক্ষাদান পদ্ধতি।
যেমন-

- ❑ রাসূল (সঃ) ওজু করতেন। সাহাবায়েকিরাম দেখতেন তিনি কি নিয়মে ওজু করছেন। এটি ওজুর নফল, এটি ওজুর আদব, এভাবে বিশ্লেষণ করে রাসূল (সা.) বলে দিতেন না।
- ❑ রাসূল (সঃ) নামাজ পড়তেন, সাহাবায়েকেরাম তা দেখতেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম ঐ দেখা নিয়ম অনুযায়ী নামাজ পড়তেন।
- ❑ তিনি হজ্ব পালন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর হজ্ব পালন পদ্ধতি দেখে সে অনুযায়ী হজ্ব পালন করতেন।
- ❑ ওজুতে চার ফরজ না ছয় ফরজ এভাবে ব্যাখ্যা করে রাসুল (সঃ) বলে দিতেন না।

২. রাসূল (সা.) সাধারণত সাহাবীদের সাধারণ সভায় দীনি কথাবার্তা বলতেন এবং শিক্ষা দিতেন। একজন সাহাবী-

- ❑ রাসূল (সঃ) কে যেভাবে ইবাদাত করতে দেখতেন এবং তাঁর থেকে যেভাবে ফতোয়া ও ফয়সালা শুনতেন, সেভাবেই তা আয়ত্ত করে নিতেন এবং আমল করতে থাকতেন।
- ❑ অতঃপর তিনি পরিবেশ, পরিস্থিতি ও অবস্থা বিচার করে রাসূল (সঃ) এর ঐ সব বক্তব্য বা আমলের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করে নিতেন ।
- ❑ এভাবে তারা কোন হুকুমকে নির্ণয় করতেন মুবাহ্, কোনটি মুস্তা-হাব এবং কোনটি মানসুখ (রহিত)।
- ❑ ঐ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামগণ দার্শনিক দলিল প্রমাণ অবলম্বন করতেন না। তাঁরা অবলম্বন করতেন তাঁদের মনের প্রশান্তি, প্রসন্নতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

খ. রাসূল (সাঃ) এর এন্তেকালের পরের অবস্থা

রাসূল (সাঃ) এর যুগ পর্যন্ত উপরোল্লিখিতভাবে সাহাবায়েকেরামগণ আমল করতেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে

পড়েন। যে যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই নেতৃত্ব লাভ করেছেন। এ সময়ে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন ঘটনা ও সমস্যাবলী তাঁদের সামনে আসতে থাকে এবং লোকেরা ঐ সব বিষয়ে তাঁদের নিকট ফতোয়া ও ফয়সালা চাইতে থাকে। প্রত্যেক সাহাবী নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী ঐ সব ব্যাপারে ফতোয়া ও ফয়সালা দিতেন-

ক. প্রত্যেক সাহাবী তাঁর জানা প্রমাণিত জ্ঞানের (কুরআন ও সুন্নাহ্) আলোকে জবাব দিতেন।

খ. ঐভাবে যদি সমাধান না পাওয়া যেত তবে তাঁরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, তা হচ্ছে-

❑ রাসূল (সাঃ) এর দেয়া যেসকল বিধান বা ফয়সালা তিনি জানতেন সেগুলো কি কারণ বা উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতেন। অতঃপর তাঁর কাছে জানতে চাওয়া প্রশ্নটির কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে, রাসূল (সাঃ) এর দেয়া যে ফয়সালার কারণ ও উদ্দেশ্যের মিল দেখতে পেতেন সেটিতে তারা রাসূল (সাঃ) দেয়া ফয়সালার অনুরুপ ফয়সালা বা বিধান দিয়ে দিতেন।

❑ পূর্ণ তাকওয়া ও ঈমানদারীর সঙ্গে তাঁরা ঐ কাজ করতেন।

❑❑ সকল সাহাবীর পক্ষে ২৪ ঘন্টা রাসূল (সাঃ) এর সঙ্গে থেকে সকল সুন্নাহ জানা সম্ভব ছিল না। আবার সকল মানুষের বুঝার ক্ষমতাও এক নয়। তাই উপরের তথ্যের অলোকে সহজেই বলা যায় যে, সাহাবায়ে কিরামগণের যুগেই সুন্নাহ জানা, বিভিন্ন সুন্নাহর গুরুত্ব নির্ধারণ করা এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্নতা বা মতপার্থক্য আরম্ভ হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামগণের মতপার্থক্যের ভিত্তি যে সকল মৌলিক কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল

ক. রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ জানা থাকা বা না থাকার পার্থক্য

এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রধান কারণ। সকল সাহাবী রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহ জানতেন না। আর তা জানা সম্ভবও ছিল না। কারণ রাসূল (সা.) এর ২৪ ঘন্টার জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত সকল সাহাবী তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সকল কাজ দেখবেন বা সকল কথা শুনবেন, এটা মোটেই বাস্তব সম্মত নয়। যে সাহাবীর (রা.) কোন একটা প্রশ্ন বা সমস্যা সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য জানা থাকতো না, সে বিষয়ে তিনি বাধ্য হয়ে ইজতিহাদ (কুরআন বা হাদীসে উপস্থিত থাকা তথ্যের আলোকে নিজ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে আসা) করতেন। পরবর্তীতে এরূপ ইজতিহাদের যে অবস্থা হত তা হচ্ছে–

১. কখনো এরূপ ইজতেহাদ হাদীসে রাসূলের অনুরূপ হয়ে যেত।
২. কখনো একটি মাসআলা সম্বন্ধে দু'জন সাহাবীর মধ্যে আলোচনা হতো। এ আলোচনায় কোন সহীহ হাদীস তাঁদের সামনে এসে গেলে মুজতাহিদ তাঁর ইজতেহাদ পরিত্যাগ করে হাদীসটি গ্রহণ করতেন।
৩. কখনো এমন হতো যে, ইজতিহাদকারী সাহাবীর নিকট হাদীস পোঁছেছে বটে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য পন্থায় পৌঁছায়নি। এমন অবস্থায় মুজতাহিদ বর্ণনাটি পরিত্যাগ করতেন এবং নিজের ইজতিহাদের ওপর আমল করতেন।
৪. কখনো এমনও হত যে, মুজতাহিদ সাহাবীর নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীসই পৌঁছেনি। ফলে তাঁর ইজতেহাদ হাদীসে রাসূল (সা.) এর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হলেও তার ওপর তিনি আমল করে যেতেন।

খ. রাসূল (সা.) এর কাজের গুরুত্ব নির্ণয়ের পার্থক্য

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এটি। নবী কারীম (সা.) কে একটি কাজ করতে সাহাবায়ে কেরামগণ দেখতেন কিন্তু মানুষের বিবেক-বুদ্ধির প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে কাজটির গুরুত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হত। ফলে কেউ রাসূল

(সা.) এর উক্ত কাজটিকে মনে করেছেন ইবাদাত তথা গুরুত্বপূর্ণ। আর কেউ তাকে মনে করেছেন মুবাহ্ অর্থাৎ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

উদাহরণ স্বরুপ হজ্বের সময় রাসূল (সা.) এর আবতাহ্ উপত্যকায় অবতরণের ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা.) ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) এর দৃষ্টিতে এই অবতরণের ঘটনাটি ইবাদাতের অন্ত র্ভুক্ত ছিল। তাই তাঁরা এটাকে হজ্বের সুন্নত বলে গণ্য করতেন। কিন্তু আয়েশা (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর মতে তিনি সেখানে ঘটনাক্রমে অবতরণ করেছিলেন। সুতরাং সেটা হজ্বের সূন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

গ. রাসূল (সা.) এর কাজের বা বক্তব্যের কারণ বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারা না পারার পার্থক্য

সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আর এটাও হয়েছে কোন একটি বিষয় বা কথার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতায় মানুষে মানুষে স্বাভাবিক পার্থক্য থাকার কারণে।

উদাহরণ স্বরুপ মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত ইবনে উমর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করা যায়। হাদীসটি হচ্ছে- 'রাসূল (সা.) বলেছেন, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তিকে আযাব দেয়া হয়।' এ বক্তব্য শুনে আয়েশা (রা.) বললেন, 'এটা ইবনে উমরের ধারণাপ্রসূত কথা। রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং স্থান, কাল, পাত্র তিনি আয়ত্ত করে রাখেননি।' প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ইয়াহুদী মহিলার কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, তার আপনজনরা মাতম করছে। তিনি বললেন, 'এরা এখানে তার জন্যে কান্নাকাটি করছে, অথচ কবরে তার আযাব হচ্ছে'। এখানে ইবনে উমর (রা.) রাসূল (সা.) এর বক্তব্যের যথার্থ উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে পারেননি। তিনি মনে করেছেন কান্নাকাটির কারণেই মৃত ব্যক্তির আযাব হয়েছে এবং তা সকল মৃত ব্যক্তির জন্যে প্রযোজ্য। অথচ রাসূল (সা.) এর বক্তব্য ছিল কেবল উক্ত মৃত ব্যক্তির জন্যে নির্দিষ্ট (Specific) এবং বক্তব্যে তিনি কান্নাকাটিকে আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেননি।

এ বিষয়ে আর একটি উদাহরণ হচ্ছে–কফিন অতিক্রমকালে দাঁড়ানোর সুন্নাহটি। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী (রা.) বলেছেন, দাঁড়ানোর কারণ হচ্ছে প্রত্যেক কফিনের সঙ্গে ফেরেশতা থাকে। তাই ঐ ফেরেশতার সম্মানার্থে দাঁড়াতে হয়। এ মত অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি মুমিন হোক বা কাফের হোক-সর্বাবস্থায় দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ বলেছেন, মৃত্যু ভীতির জন্য দাঁড়াতে হয়। এ মত অনুযায়ীও মৃতু ব্যক্তি মুমিন হোক বা কাফের হোক- উভয় অবস্থাতেই দাঁড়াতে হবে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, রাসূল (সা.) এর পাশ দিয়ে এক ইয়াহুদীর লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাঁর মাথার ওপর দিয়ে ইয়াহুদীর লাশ অতিক্রম করাকে তিনি অপছন্দ করলেন, তাই তিনি দাঁড়ালেন। এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে দাঁড়ানোটা শুধু কাফিরের কফিনের জন্য নির্দিষ্ট।

ঘ. ভুলে যাওয়ার কারণে মতপার্থক্য

সাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে ভুলে যাওয়া, যা মানুষের জন্যে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

এর উদাহরণ হচ্ছে জামাউল ফাওয়ায়িদে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনাকৃত একটি হাদীস। ইবনে উমর (রা.) বলতেন, 'রাসূল (সা.) একটা উমরা করেছেন রজব মাসে'। এ বক্তব্য অবগত হয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'ইবনে উমর ব্যাপারটা ভুলে গেছেন'।

ঙ. সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে মতপার্থক্য

কোন বিধানের বৈপরীত্য নিরসন করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ হচ্ছে- 'মুতআ বিয়ে'। রাসুল (সা.) খাইবার যুদ্ধের সময় 'মুতআ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর আবার তা নিষেধ করে দেন। অতঃপর 'আওতাস' যুদ্ধের সময় আবার মুতআ বিয়ের অনুমতি দেন কিন্তু এবারও যুদ্ধের পর অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। এখন এ বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর মত হলো, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে 'মুতআর' অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রয়োজন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সুতরাং অনুমতি প্রয়োজন ও অবস্থার গুরুত্বের সাথে সম্পর্কিত।

এ জন্যে অনুমতি স্থায়ী। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীর মত এর বিপরীত। তাদের মত হলো, মুতআ বিয়ের অনুমতিটা ছিল মুবাহ পর্যায়ের। নিষেধাজ্ঞা সে অনুমতিকে স্থায়ীভাবে রদ (মানসুখ) করে দিয়েছে।

❑❑ উপরোক্ত বাস্তব কারণে রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ জানা, সুন্নাহর গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং সুন্নাহর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে এ মতপার্থক্য তাবেয়ী ও পরবর্তীদের যুগেও পৌঁছায় এবং তা আরো ব্যাপক হয়।

হাদীস শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

হাদীস শব্দটি কুরআনে বক্তব্য, বাণী, খবর, ঘটনা, সপ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে অসংখ্যবার ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন যেখানে হাদীস বলতে কারো বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে সেখানে এগুলোর হুবহু (অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্ন ইত্যাদিসহ উল্লিখিত) রূপকে বুঝিয়েছে। আর হুবহু রূপ সবসময় নির্ভুল হয়। অর্থাৎ কুরআন যখন হাদীস শব্দটি দ্বারা রাসূল (সা.) এর বক্তব্য, বাণী বা কথা বুঝিয়েছে তখন রাসূল (সা.) এর ঐ সকল বিষয়ের নির্ভুল, হুবহু তথা অক্ষর শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্লেখিত রূপকে বুঝিয়েছে। তাই কুরআন অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর হাদীস শব্দের সংজ্ঞা হল রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু, নির্ভুল বা দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উল্লেখিতরূপ।

হাদীস শাস্ত্রে হাদীস শব্দটি একটি পরিভাষা হিসেবে নেয়া হয়েছে। আর এর অর্থ বা সংজ্ঞা ধরা হয়েছে-রাসূল (সা.) এর পরের ৪ (চার) স্তরের (সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী) ঈমানের দাবিদার ব্যক্তিদের, রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নিজ বুঝের, স্বীয় শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপন করা বক্তব্য। অথবা ঐ সকল ব্যক্তি কর্তৃক তার পূর্বের স্তরের ব্যক্তির কথা, কাজ বা সমর্থনের হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন ও যতিচিহ্নসহ উপস্থাপন করা বক্তব্য। কিন্তু কারো কথা, কাজ বা সমর্থন হুবহু বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব। তাই হাদীস শাস্ত্রে হুবহু উপস্থাপিত হওয়া হাদীসের সংখ্যা ভীষণ কম বা

হাতে গোণা কয়েকটি। হাদীস শাস্ত্রের হাদীসের এই সংজ্ঞার দূর্বল দিকগুলো হলো–

১. ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি মুনাফিকও হতে পারে

২. মানুষের বুঝের ভুল হতে পারে

৩. নিজ শব্দ প্রয়োগ করে উপস্থাপনের সময়ও ভুল হতে পারে

এ দুর্বলতার সুযোগে ইচ্ছাকৃতভাবে বানানো বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাধ্যমে রাসূল (সা.) বলেননি এমন অনেক কথা রাসূল (সা.) এর কথা তথা হাদীস হিসেবে চালু হয়ে যায়। ফলে ইসলামে ব্যাপক বিভ্রান্তি ঢুকে পড়ে। মিথ্যা বা ভুল হাদীসের ব্যাপকতা কী পরিমাণ ছিল তা সহজে বুঝা যায় ইমাম বুখারীর ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই করে পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৭০০ (দুইহাজার সাত শত) হাদীস, সহীহ পাওয়ার তথ্যটির মাধ্যমে।

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এটি বুঝতে পেরে, হিজরী ৩ (তিন) শতকে হাদীস বর্ণনাকারীদের গুণাগুণ যাচাই করার জন্যে আসমা-উর-রিজাল নামের এক বিস্ময়কর গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর তাকওয়া, পরহেজগারী, সত্যবাদিতা, পরিচিতি, বংশ, স্মরণশক্তি, বিচক্ষণতা ইত্যাদি দিক বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা সূত্রের (সনদ) ত্রুটিহীনতার উপর ভিত্তি করে হাদীসকে সহীহ ও গায়ের সহীহ নামে ভাগ করেন। মুহাদ্দিসগণ এটি জানতেন যে তাদের দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী সহীহ্ হাদীস বলতে বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল হওয়া হাদীস বুঝায় না। তাই তারা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে ধারণা দেয়ার জন্যে সহীহ হাদীসকে আবার ৪ (চার) ভাগে ভাগ করেন। যথা-

১. মুতাওয়াতির সহীহ

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রতি স্তরে অসংখ্য তাকে মুতাওয়াতির সহীহ হাদীস বলা হয়। এ সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একশত ভাগ।

২. **মশহুর সহীহ**

যে সহীহ্ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে তিন জনের কমে নামে নাই তাকে মশহুর সহীহ্ হাদীস বলা হয়। এ সহীহ্ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মুতাওয়াতির সহীহ হাদীসের চেয়ে কম।

৩. **আজিজ সহীহ**

যে সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে দুই জনের কমে নামে নাই। আজিজ সহীহ্ হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা মশহুর সহীহ হদীসের চেয়ে কম।

৪. **গরীব সহীহ**

যে সহীহ্ হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন স্তরে ১ (এক) জন তাকে গরীব সহীহ হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীসের বক্তব্য বিষয় নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম।

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'প্রচলিত হাদীস শাস্ত্রে সহীহ্ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** নামক বইটিতে।

উপরের আলোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায় সুন্নাহ এবং হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত তথা চালু হয়ে যাওয়া হাদীস শব্দের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সুন্নাহ হল রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের নির্ভুল রূপ। কিন্তু প্রচলিত 'হাদীস' শব্দটির অর্থ তা নয়। তাইতো হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সকল সূন্নাহ হাদীস কিন্তু সকল হাদীস সুন্নাহ নয়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের উৎপত্তির সময় এবং কারণ

রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ থেকে ইসলামের বিধি-বিধান বের করার ব্যাপারে সাহারায়ে কেরামগণের সময়েই মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। এটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগে তা আরো ব্যাপক হয়। পরবর্তীতে মুজতাহিদগণ দেখলেন, পূর্বে ইখতিলাফপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করা হয়নি। তা করলে তাদের ইজতিহাদসমূহ, ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত (মাহফুজ) হত। তাই মুজতাহিদগণ এ বিষয়ে মূলনীতি (উসূল) নির্ধারণ করে গ্রন্থ রচনায় হাত

দেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ বিষয়ে (উসূলে ফিক্‌হের) প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনিই উসূলে ফিক্‌হের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এরপর উসূলে ফিকাহ নিয়ে অনেক চিন্তা-গবেষণা করা হয় এবং বর্তমান যে ফিকাহ শাস্ত্র আমাদের নিকট আছে তা পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অনেক কষ্ট-সাধনা ও চিন্তা-গবেষণার ফল। এটা তৈরি করে দিয়ে তারা জাতির অনেক বড় খেদমত করেছেন। ঐ উসূলে ফিকাহের ভিত্তিতে মুজতাহিদগণ যেমন বের করেছেন ইসলামী শরীয়ায় কোন্ আমল তথা কোন হাদীস বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁরা বের করেছেন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামের বিধান।

ফিকাহ্ শাস্ত্র রাসূল (সা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের আমলকে গুরুত্ব অনুযায়ী যে ভাবে ভাগ করেছে

সুধী পাঠক, চলুন এখন দেখা যাক, ফিকাহ শাস্ত্র রাসূল (সা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের সকল আমলকে গুরুত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করে কি ভাবে ভাগ করেছে। পূর্বেই বলা হয়েছে রাসূল (সা.) এর জীবনের সকল কাজ তথা ইসলামের সকল আমল গুরুত্ব অনুযায়ী একই পর্যায়ের নয়। তাই ইসলাম পালনের সময় গুরুত্ব অনুযায়ী আমলগুলো পালন করা সহজতর করার জন্যে ফিকাহশাস্ত্র রাসূল (সা.) এর হাদীসের ভিত্তিতে, ইসলামের সকল আমলকে গুরুত্ব অনুযায়ী চার ভাগে ভাগে করেছে। যথা–

ক. করণীয় আমল

১. ফরজ

ফরজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ অবশ্যকরণীয় বা বাধ্যতামূলক। তাই ফিকাহশাস্ত্র গুরুত্বের দিক দিয়ে যে হাদীসগুলোকে প্রথম অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত করণীয় কাজকে নাম দিয়েছে ফরজ। ফিকাহ শাস্ত্র মতে, ফরজ অস্বীকারকারী কাফির। কঠিন ওজর ছাড়া ফরজ আমল ত্যাগ করা বড় (কবীরা) গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ফিকাহ শাস্ত্রে ফরজ দু'প্রকার। ফরযে আইন- যা সকল মুসলমানের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে করা অপরিহার্য। যেমন- কুরআনের জ্ঞান অর্জন,

নামাজ, রোজা ইত্যাদি। ফরযে কেফায়া-যে ফরজগুলো ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য। অর্থাৎ যে ফরজ কিছু লোকে আদায় করলে সকলের জন্যে আদায় হয়ে যায়। যেমন- জানাযার নামাজ, মৃত ব্যক্তির দাফন ইত্যাদি।

২. **ওয়াজিব**

ফিকাহশাস্ত্র গুরুত্বের দিক দিয়ে যে হাদীসগুলোকে দ্বিতীয় অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত করণীয় কাজকে নাম দিয়েছে ওয়াজিব। ফিকাহ্শাস্ত্র মতে ওয়াজিব বিষয়গুলো পালন করা সকল মুসলমানের জন্যে অপরিহার্য এবং ওয়াজিব বিনা ওজরে ত্যাগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তথা কবিরা গুনাহ (অবশ্য সকল ফিকাহবিদ এ বিষয়ে একমত নন)। তবে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কেউ কাফির হয় না, এ বিষয়ে সকল ফিকাহবিদ একমত।

৩. **সুন্নাত**

ফিকাহশাস্ত্র গুরুত্বের দিক দিয়ে যে হাদীসগুলোকে তৃতীয় অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত করণীয় কাজকে নাম দিয়েছে সুন্নাত। তবে ফিকাহশাস্ত্রে সুন্নাত আমল অস্বীকার করলে কেউ কাফির হবে না। সুন্নাত আমল দু'প্রকার, মুয়াক্কাদাহ এবং গায়েরে মুয়াক্কাদাহ।

যে আমলগুলো রাসূল (সা.) প্রায় সময় করেছেন এবং ওযর ব্যতীত কখনও পরিত্যাগ করেননি, তাকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। তবে যারা তা করেননি, তাদেরকে রাসূল (সা.) সতর্কও করেননি। এ ধরনের সুন্নাত বিনা ওযরে ছেড়ে দেয়া বা ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করা গুনাহ।

যে কাজগুলো রাসূল (সা.) করেছেন আবার কখনও ছেড়েও দিয়েছেন তাকে সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ বলা হয়েছে। এ সুন্নাত আমলগুলো করলে সওয়াব, না করলে গুনাহ হয় না।

৪. **নফল**

নফল শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। ফিকাহশাস্ত্র গুরুত্বের দিক দিয়ে যে হাদীসগুলোকে চতুর্থ অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত

করণীয় কাজকে নাম দিয়েছে নফল। ফিকাহ্ শাস্ত্রে নফল আমল হচ্ছে সে আমলগুলো যা রাসূল (সা.) মাঝে মাঝে করেছেন তবে অধিকাংশ সময় ছেড়ে দিয়েছেন। এ আমল করলে সওয়াব আছে তবে না করলে গুনাহ্ হয় না এবং অস্বীকার করলে কাফির হবে না।

খ. নিষিদ্ধ আমল

১. হারাম

ফিকাহশাস্ত্র, নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় বিষয় উপস্থিত থাকা হাদীসের মধ্যে যেগুলোকে গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রথম অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত বিষয়টির নাম দিয়েছে হারাম। ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে, হারাম অস্বীকারকারী কাফির। কঠিন ওজর ছাড়া হারাম বিষয় পালন করা বড় (কবীরা) গুনাহ্ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২. মাকরুহ্ তাহ্রীমি

ফিকাহশাস্ত্র, নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় বিষয় উপস্থিত থাকা হাদীসের মধ্যে যেগুলোকে গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত বিষয়টির নাম দিয়েছে মাকরুহে তাহ্রীমি। ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে মাকরুহে তাহ্রীমি অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। তবে ওজর ছাড়া এ ধরনের কাজ করলে গুনাহ্গার হতে হবে।

৩. মাকরুহ্ তানযীহি

ফিকাহশাস্ত্র, নিষিদ্ধ বা বর্জনীয় বিষয় উপস্থিত থাকা হাদীসের মধ্যে যেগুলোকে গুরুত্বের দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে মনে করেছে তাতে বর্ণনাকৃত বিষয়টির নাম দিয়েছে মাকরুহে তানযীহি। ফিকাহ্ শাস্ত্র মতে মাকরুহে তানযীহি থেকে দূরে থাকলে সওয়াব হবে, তবে করলে গুনাহ্গার হবে না।

ফিকাহশাস্ত্রে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, হারাম ও মাকরুহের সংজ্ঞায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয়

ফিকাহশাস্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী শুধু ফরজ ও হারাম অস্বীকার করলে কাফির হয় কিন্তু ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরুহ্ অস্বীকার করলে কাফির হয় না। কিন্তু এ কথা তো নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআনের কোন একটি

বক্তব্য এবং রাসূলের (সা.) কোন একটি সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস অস্বীকার করলে অবশ্যই কাফির হবে। কারণ কুরআনের কোন একটি বক্তব্য অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর রাসূল (সা.) এর কোন একটি সুন্নাহ তথা নির্ভুল হাদীস অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে রাসূল (সা.) কেই অস্বীকার করা। তাহলে ওয়াজিব, সুন্নাত. নফল ও মাকরুহ অস্বীকার করলে কাফির হবে না কেন? চিন্তার বিষয়, তাই না? ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরুহ অস্বীকার করলে কাফির না হওয়ার কারণ হচ্ছে ঐগুলো যে, রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন অথবা ঐ ভাবে বা ঐ রকম গুরুত্ব দিয়ে করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন তা নিশ্চিত নয়। যে বিষয় সঠিক হওয়া নিশ্চিত নয় তার ভিত্তিতে কাউকে কাফির বলা সিদ্ধ নয়। তাই ফিকাহশাস্ত্র, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মাকরুহ অস্বীকারকারীকে কাফির বলে নাই।

ফিকাহশাস্ত্রে ইসলামের সকল আমলের উপরোক্তভাবে শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ যে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছে

চলুন এখন, ফিকাহ শাস্ত্রে হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের সকল কাজকে গুরুত্ব অনুযায়ী উপরোক্ত সংজ্ঞা দেয়া ও নামকরণ করার যে দিকগুলো বর্তমান মুসলমান সমাজে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেগুলো দেখা যাক-

ক. ফরজ বিষয়গুলো বাছাই করার সমস্যা এবং তার ফল

ফিকাহ শাস্ত্রে যে আমলগুলো অপরিহার্য, অস্বীকার করলে কাফির হয় এবং পালন না করলে কবীরা গুনাহ হয়- তাকে ফরজ বলা হয়েছে। যেহেতু রাসূল (সা.) নিজে কোন হাদীসটি বেশি ও কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ বা কোন হাদীসের বিষয়টি ফরজ আর কোন হাদীসের বিষয়গুলো অন্যবিভাগের তা নির্দিষ্ট করে বলে যাননি, সেহেতু কোন আমলটি ফরজ বিভাগে পড়বে তা কেউ সহজে বলতে চাননি। কারণ, কাফির ঘোষণা দেয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আবার প্রায় সব হাদীস রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহের ভাব বর্ণনা, শাব্দিক তথা হুবহু বর্ণনা নয়। তাই, ১৪০০ বছর পরেও আজ ফরজ বিষয়গুলোর সঠিক এবং পরিপূর্ণ কোন তালিকা মুসলমান জাতির সামনে

উপস্থিত নেই। আর এই শূন্যস্থান পূরণ করেছে অদূরদর্শী লোক দ্বারা তৈরি করা ফরজ আমলগুলোর কিছু অগ্রহণযোগ্য তালিকা। ঐ তালিকার বদৌলতে আজ অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান জানে ইসলামে ফরজ আমল হচ্ছে ১৪০টির মত। যথা- নামাজের ১৩টি, রোজার ৬০টি (৩০ রোজা, ৩০ নিয়াত), হজ্বের ৩টি, ওজুর ৪টি, গোসলের ৩টি ইত্যাদি। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ঐ ১৪০টি ফরজ হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত ৮ বা ১০ টি প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় বা সেগুলোর মৌলিক আরকান-আহ্কাম। ঐ অসতর্ক লিস্টের বদৌলতে সাধারণ মুসলমানরা প্রকৃতভাবে মাত্র ৮-১০টা কাজকেই ফরজ হিসেবে জানে এবং মানে। অথচ ইসলামে এর বাইরে অনেক প্রথম স্তরের ফরজ তথা প্রথম স্তরের মৌলিক কাজ আছে।

খ. ওয়াজিব বিষয়গুলো বাছাই করার সমস্যা এবং তার ফল

ফিকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী ওয়াজিব হচ্ছে ঐ অপরিহার্য বিষয়গুলো যা অস্বীকার করলে কাফির হয় না কিন্তু অনুসরণ না করলে কবীরা গুনাহ হয় এবং গুরুত্ব অনুযায়ী যার অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে। ফরজের ন্যায় এই শর্ত পূরণ করে ওয়াজিব কাজগুলো বাছাই করাও দারুণ কঠিন কাজ। আর এ জন্যেই ফরজ বিষয়ের ন্যায় ওয়াজিব বিষয়ের কোন সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা মুসলমান জাতির সামনে আজ নেই। বর্তমানে অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান বেতেরের নামাজ, ঈদের নামাজ এবং নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি ইবাদাতগুলোর ওয়াজিব রুকনগুলোকেই শুধু ওয়াজিব হিসেবে জানে।

গ. সুন্নাত বিষয়গুলো বাছাই করার সমস্যা ও তার ফল

গুরুত্ব অনুযায়ী যে আমলগুলোর অবস্থান তৃতীয় স্থানে, ফিকাহ শাস্ত্র তার নাম দিয়েছে সুন্নাত। ফরজ ও ওয়াজিব বিষয়গুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা না থাকা এবং তৃতীয় অবস্থানের আমলগুলোর আবার সুন্নাত নাম দেয়ায় বর্তমান মুসলমান সমাজে, ইসলাম পালনের ব্যাপারে এক বিরাট সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু ১ম ও ২য় অবস্থানের আমলগুলোর সঠিক ও পরিপূর্ণ তালিকা নেই সেহেতু অসতর্ক তালিকায় উপস্থাপন করা কয়েকটি আমল বাদে ইসলামের অন্য সকল বিষয়কে সাধারণ মুসলমানগণ সুন্নাত

হিসেবে জানে। আর এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে তারা জানে ফিকাহশাস্ত্রের সুন্নাত নামের আমলগুলোকে। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের গুরুত্ব অনুযায়ী তৃতীয় অবস্থানে অবস্থিত সুন্নাহে উপস্থিত থাকা আমলগুলোকে। ফিকাহশাস্ত্রের ঐ সুন্নাতের কয়েকটি হচ্ছে- নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি ইবাদাতের সুন্নাত বিষয়গুলো, টুপি বা পাগড়ি মাথায় দেয়া, দাড়ি রাখা, মিষ্টি খাওয়া, মেছওয়াক করা, আতর মাখা, মাটিতে বসে দস্তরখান বিছিয়ে খাওয়া ইত্যাদি। তাই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান হাতে গোনা কয়েকটি বাদে, রাসূলের সুন্নাহের গুরুত্বের দিক দিয়ে ১নং অবস্থানের অনেক সুন্নাহের আমলকে বাদ দিয়ে, ৩নং অবস্থানের সুন্নাহে বর্ণনাকরা আমলকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছে। এর ফলে তাদের দুনিয়ার জীবন যেমন আজ ব্যর্থ হচ্ছে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আজ যেমন শান্তি, শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এবং প্রগতি নেই, তেমনই তাদের আখেরাতের জীবনও ব্যর্থ হবে বলে মনে হয়।

তাই মুসলমান জাতির মধ্যে যারা আজ সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন, তাদের নিকট আকুল আবেদন, ফিকাহশাস্ত্রে রাসূলের (সা.) সুন্নাহের ভিত্তিতে ইসলামের সকল আমলের গুরুত্ব অনুযায়ী দেয়া সংজ্ঞা ও নামকরণ নিয়ে আবার চিন্তা-গবেষণা করার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে এবং জাতিকে এই অনিচ্ছাকৃত অকল্যাণ থেকে মুক্তি দিতে।

রাসূল (সা.) এর হাদীসকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করার সহজতম উপায়

চলুন এখন দেখা যাক, রাসূলের (সা.) হাদীসকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করার সহজ কোন উপায় আছে কিনা। বিষয়টি বুঝতে হলে কুরআন ও সুন্নাহের নিম্নোক্ত তথ্যগুলো আগে জানা দরকার-

তথ্য-১

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

অর্থঃ তিনি (আল্লাহ্‌) নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ (কুরআন) পাঠ করে শুনান। তাদের পবিত্র করেন এবং কিতাব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেন। (জুময়া /৬২: ০২)

ব্যাখ্যাঃ এখানে মুসলমানদের গড়ে তোলার জন্যে রাসূল (সা.) কী কী কাজ করতেন, তা বলা হয়েছে। আল-কুরআনের আরো তিন জায়গায় (বাকারা: ২৯ ও ১৫১ এবং আল-ইমরানঃ ১৬৪) একই ধরনের কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে মুসলমানদের গড়ে তোলার জন্যে রাসূল (সা.) চার ধরনের কাজ করতেন। যথা-

১. **কুরআন তেলাওয়াত করে শুনানো।**
অর্থাৎ কুরআনেরবক্তব্যগুলো সাধারণভাবে পড়ে পড়ে জানিয়ে দেয়া। এটাই ছিল মুসলমানদের গড়ার ব্যাপরে তাঁর প্রথম কাজ।

২. **পবিত্র করা।**
অর্থাৎ কুরআন তথা ওহীর জ্ঞান অনুযায়ী তিনি মুসলমানদের চরিত্রকে ঢেলে সাজাতেন।

৩. **কিতাবের জ্ঞান দেয়া।**
অর্থাৎ কুরআনের যে সকল স্থানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেগুলো কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিতেন।

৪. **জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া।**
অর্থাৎ ইসলামকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান দরকার তারও শিক্ষা দিতেন।

এখান থেকে বুঝা যায়, কুরআনের বক্তব্যগুলো কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে এবং ব্যাখ্যা করে জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেয়া ছিল মানুষ গড়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর প্রথম কাজ।

তথ্য-২

প্রশ্ন আসতে পারে রাসূল (সা.) যে কুরআনের সকল বক্তব্য, তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে ও ব্যাখ্যা করে জানিয়েছিলেন, তার প্রমাণ কী? দু'একটা বক্তব্য তিনি না-ও জানিয়ে থাকতে পারেন। না এটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, পূর্বে উল্লিখিত সূরা

বাকারার ৮৫নং ও সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আল-কুরআনের একটি মূল বিষয়ও কেউ অনুসরণ না করলে তার সকল কর্মকাণ্ড ব্যর্থ হবে এবং তাকে দোযখে যেতে হবে। তাই রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত একটি বিষয়ও নিজে করেননি বা অপরকে করতে বলেননি, এমনটি হতেই পারে না।

তথ্য-৩

আবার প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের দু' একটা বক্তব্য ভুলে যাওয়ার দরুন রাসূল (সা.) মুসলমানদের জানাননি, এমনটিও তো হতে পারে। না, তাও হতে পারে না। কারণ আল-কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত একটি বিষয়ও যাতে ভুলে না যান, সে দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তথ্যটি আল্লাহ জানিয়েছেন সূরা ক্বিয়ামাহের ১৬ ও ১৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আয়াত দু'টি হচ্ছে-

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ.

অর্থ: (হে নবী, নাযিলের সময় কুরআনকে) তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্যে আপনার জিহ্বাকে নাড়াবেন না। এটা মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব।

ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিল শুরু হওয়ার প্রথম দিকে, ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.) এর নিকট থেকে কোন আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে , বারবার উচ্চারণ করে রাসূল (সা.) তা মুখস্থ করে নেয়ার চেষ্টা করতেন। রাসূল (সা.) এর এই প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে জিব্রাইল (আ.) এখানে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনের কোন কথা তিনি যাতে কোনভাবে ভুলে যেতে না পারেন, সে দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। তাই কুরআনের কোন বক্তব্য ভুলে যাওয়ার দরুন রাসূল (সা.) করেননি বা বলেননি, এমনটি হতে পারে না।

❑❑ উপরের তথ্যগুলো জানার পর একথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায় যে, রাসূল (সা.) কুরআনে উল্লেখিত সকল বিষয় নিজের কাজ, কথা ও সমর্থনের মাধ্যমে মুসলমানদের সাধারণভাবে এবং ব্যাখ্যা করে, জানিয়ে

এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন। তবে রাসূল (সা.) এর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি আরো কিছু কাজ করেছেন বা কথা বলেছেন, যা কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা কুরআনের কোন বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক নিয়ম- কানুনও নয়। সংজ্ঞা অনুযায়ী রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন এমন সকল কাজই রাসূলের সুন্নাহ এবং তা ইসলামের বিষয়। তাই সেগুলোও রাসূলের সুন্নাহ অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে পালনীয়। অন্য দিকে এটা বুঝাও মোটেই কঠিন নয় যে, রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহ সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থাৎ অবশ্যই কোনটি বেশি এবং কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ হবে।

বেশি ও কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো সে ব্যাপারে উল্লেখিত তথ্যসমূহের সারসংক্ষেপ

সুন্নাহ ও হাদীস সম্পর্কে উল্লেখিত তথ্যগুলো জানার পর সহজেই বলা যায় যে, গুরুত্ব অনুযায়ী হাদীসের শ্রেণীবিভাগ হবে নিম্নোক্তভাবে–

ক. প্রথম স্তরের হাদীস

যে হাদীসের বক্তব্য কুরআনের মূল বক্তব্যের অনুরূপ, তার বর্ণনাধারায় (সনদে) কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

খ. দ্বিতীয় স্তরের হাদীস

যে হাদীসের বক্তব্য-

- ❑ কুরআনের কোন মূল বিষয়ের, কুরআনে উপস্থিত থাকা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক নিয়ম-কানুনের অনুরূপ। তার বর্ণনাধারায় (সনদে) কিছু দুর্বলতা থাকলেও। অথবা,
- ❑ কুরআনের কোন মূল বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক নিয়ম-কানুন কিন্তু তা কুরআনে নেই। এ ধরনের হাদীস সনদের ভিত্তিতে সর্বাধিক শক্তিশালী (মুতাওয়াতির) হতে হবে এবং তা কুরআনের কোন বক্তব্যের বিরুদ্ধ হতে পারবে না।

গ. তৃতীয় স্তরের হাদীস

যে প্রচলিত সহীহ্ হাদীস কুরআনের কোন মূল বক্তব্যের অনুরূপ বা তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয় নয় এবং তার বক্তব্য কুরআনের কোন বক্তব্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী নয়।

ঘ. হাদীস নয়

যে হাদীস কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত।

সুন্নাহ্ তথা রাসূল (সঃ) এর হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামের সকল আমলের গুরুত্ব অনুযায়ী সঠিক শ্রেণীবিভগ

১. প্রথম স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়)

এ বিষয়গুলো হলো ইসলামের মূল ফরজ ও হারাম বিষয়। এ বিষয়গুলো নির্ণিত হবে প্রথম স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হাদীস থেকে।

২. দ্বিতীয় স্তরের ফরজ ও হারাম বিষয় (দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়)

এ বিষয়গুলো হলো ইসলামের মূল ফরজ ও হারাম বিষয়গুলোর বাস্ত বায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এ গুলো নির্ণিত হবে দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের মাধ্যমে।

৩. নফল বিষয় (ফরজের অতিরিক্ত বা অমৌলিক বিষয়)

এ বিষয়গুলো হলো ফরজের অতিরিক্ত বিষয়। এ গুলো নির্ণিত হবে তৃতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের মাধ্যমে। গুরুত্ব অনুযায়ী এগুলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা-

ক. সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নফল

বর্তমান ফিকাহশাস্ত্র এগুলোকে ওয়াজিব নাম দিয়েছে। এ হচ্ছে সে আমলগুলো যা রাসূল (সাঃ) বেশিরভাগ সময় পালন করেছেন।

খ. মধ্যম গুরুত্বপূর্ণ নফল

বর্তমান ফিকাহশাস্ত্র এগুলোকে সুন্নাত নাম দিয়েছে। এ হচ্ছে সে আমলগুলো যা রাসূল (সাঃ) পালন করেছেন এবং ছেড়েও দিয়েছেন।

গ. সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নফল

বর্তমান ফিকাহশাস্ত্র এগুলোকে মুস্তাহাব নাম দিয়েছে। এ হচ্ছে সে আমলগুলো যা রাসূল (সাঃ) বেশিরভাগ সময় ছেড়ে দিয়েছেন।

৪. মাকরূহ (অমৌলিক নিষিদ্ধ বিষয়)

এ হবে সেই নিষিদ্ধ বিষয়গুলো যা তৃতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়।

শেষ কথা

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে তাহলে এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়, ইসলামী জীবনবিধান অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে হলে যে বিষয়টি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল কুরআনের জ্ঞান। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে সকল মুসলমানের জন্যে সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ হচ্ছে কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা। আর ইবলিস শয়তানের সব থেকে বড় কাজ অর্থাৎ সব গুনাহের বড় গুনাহ হল কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ' নামক বইটিতে।

কুরআনের জ্ঞানের ব্যাপারে বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা দেখলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইবলিস শয়তান তার ১ নং কাজের ব্যাপারে অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে। শয়তান এ কাজটি করেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে প্রতিটি স্তরে সুকৌশলে বাধা সৃষ্টি করে। ইবলিস শয়তান তো তার ১ নং কাজে সফলকাম হওয়ার চেষ্টা করবেই। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, একটি জাতির অধিকাংশ সদস্য, ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাগুলোকে কল্যাণকর (সওয়াব) কথা ভেবে ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে এবং তার উপর আমল করে যাচ্ছে। ধাপ অনুযায়ী ইবলিস শয়তানের সেই ধোঁকাবাজিমূলক কথা বা কাজগুলো হচ্ছে-

১.কুরআনের জ্ঞান অর্জনকে নিরুৎসাহিত করা

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইবলিস শয়তানের কাজের প্রথম ধাপ হচ্ছে এটি। যে যে কাজ বা কথার মাধ্যমে ইবলিস শয়তান এটা করেছে তা হচ্ছে-

ক. কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা যে, সকল মুমিনের ১ নং কাজ অর্থাৎ সব থেকে বড় সওয়াবের কাজ এবং তা না করা যে সকল মুমিনের সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ- এই তথ্যটা মুসলিমদের দৃষ্টির অগোচরে নিয়ে যাওয়া। এ ব্যাপারে ইবলিস শয়তান অবিশ্বাস্য রকমভাবে সফল হয়েছে।

খ. কুরআন বুঝা অত্যন্ত কঠিন এবং বুঝার চেষ্টা করলে গুমরাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই কুরআন না বুঝে পড়াই ভাল। এ কথাটাও ব্যাপকভাবে প্রচারিত।

গ. জানার থেকে আমলের গুরুত্ব বেশি।

ঘ. জেনে না করলে বেশি শাস্তি। তাই কম জানাই ভাল।

(বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বোল্লিখিত বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে।)

২. কুরআন যেন কেউ সহজে ধরে পড়তে না পারে সে ব্যবস্থা করা

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে ইবলিস শয়তানের প্রথম বাধাকে উপেক্ষা করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে এগুতে চায়, তারা যাতে ইচ্ছা করলেই কুরআন ধরে পড়তে না পারে সে জন্যে ইবলিস শয়তান ধোঁকাবাজি করে মুসলমান সমাজে যে কথাটা চালু করে দিয়েছে তা হচ্ছে, 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা মহাপাপ'। আর বর্তমান বিশ্বের মুসলমানরা কথাটা ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে। একজন মুসলমানের জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটার প্রভাবে, ইচ্ছা থাকলেও জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় মুসলমানরা কুরআন ধরে পড়তে পারে না। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে এ কথাটাও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। অথচ ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা পাপের কাজ এমন কোন কথা কুরআন ও হাদীসে নেই। বিষয়টি

নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?' শিরোনামের বইটিতে।

৩. কুরআন পড়েও মুসলমানরা যাতে তার জ্ঞান অর্জন না করতে পারে সে ব্যবস্থা করা

ধোঁকাবাজির প্রথম দু'টি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে অগ্রসর হয় ইবলিস শয়তান তাদেরকে আর এক অভিনব ধোঁকাবাজিমূলক কথার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। সে কথাটি হচ্ছে 'অর্থছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী'। কথাটি অর্থছাড়া কুরআন পড়াকে শুধু অনুমতিই দেয় না, তা দারুণভাবে উৎসাহিতও করে।

এই কথাটার প্রভাবে সারা বিশ্বের অসংখ্য মুসলমান আজ বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন খতম দেয়ার জন্যে ব্যস্ত। কারণ, অর্থসহ বা বুঝে পড়তে গেলে অর্থছাড়া পড়ার চেয়ে একই সময়ে কম অক্ষর পড়া হবে আর তাই সওয়াবও কম হবে। ফলে কুরআন পড়েও তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। অর্থাৎ কথাটি শয়তানের ১ নং কাজকে সফল করতে দারুণভাবে সাহায্য করছে। অথচ ঐ রকম কোন কথা কুরআন বা হাদীসের কোথাও নেই বরং তথায় এর উল্টো অনেক কথা আছে। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ না সওয়াব?' নামক বইটিতে।

৪. কুরআন জানার পর মুসলমানরা যাতে তার সকল বিষয়ে আমল করতে অগ্রসর না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

উপরের তিনটি ধাপ অতিক্রম করে যারা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করে তারা যাতে আল-কুরআনের সকল বিষয়ের ওপর আমল করতে অগ্রসর না হয়, ইবলিস শয়তান সে চেষ্টা করেছে। কারণ ইবলিস জানে, কুরআনের কিছু অনুসরণ করলে আর কিছু অনুসরণ না করলে মুসলমানরা ইসলামের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে। এ জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচারের মাধ্যমে অনেক মুসলমানদের এ কথা বিশ্বাস

বা গ্রহণ করিয়েছে যে, আল-কুরআনের কিছু কিছু বক্তব্য ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি জাতির জন্যে প্রযোজ্য, মুসলমানদের জন্যে নয়, বা আল কুরআনের কিছু আয়াতের তেলাওয়াত চালু আছে কিন্তু হুকুম চালু নেই। প্রচারণা দুটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কুরআনের প্রতিটি বক্তব্য থেকে মুসলমানদের শিক্ষা নেয়ার আছে। তা না থাকলে মহান আল্লাহ ঐ বক্তব্যগুলো কাগজের পাতায় লেখার মাধ্যমে তার সৃষ্টির কাগজ ও কালি রূপের অপরিসীম সম্পদ এবং তা পড়া ফরজ করিয়ে দিয়ে মানুষের অপরিসীম সময়ও নষ্ট করতেন না। কারণ, মহান আল্লাহ নিজেই আল-কুরআনের মাধ্যমে (বনী ইসরাইল : ২৭) জানিয়ে দিয়েছেন, 'সম্পদ ও সময়ের অপচয়কারী শয়তানের ভাই'।

সবশেষে চলুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন মুসলমান জাতির সবাইকে সব ফরজের বড় ফরজটি পালন করার তৌফিক দান করেন। যে মুসলমান তা করতে পারবেন তিনিই কেবল জানতে ও বুঝতে পারবেন ইসলামের মৌলিক কাজ কোনগুলো আর অমৌলিক কাজ কোনগুলো এবং বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো আর কম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোনগুলো। ফলে তিনিই কেবল সক্ষম হবেন মৌলিক আমল এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহের একটিও বাদ না দিয়ে ইসলামী জীবন পরিচালনা করতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াব হতে।

পুস্তিকায় কোন ভুল ধরা পড়লে গঠনমূলক ভাবে আমাকে জানিয়ে দেয়া পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব। সে সংশোধন সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমানের জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজি-ডুমুরিয়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ। ছয় বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ডুমুরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তিনি যথাক্রমে ডুমুরিয়া হাইস্কুল ও সরকারী বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে MBBS পাস করেন। দ্বিতীয় ও ফাইনাল প্রফেশনাল MBBS পরীক্ষায় তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করেন।

MBBS পাস করে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৭৯ সালে ইরাক সরকারের চাকুরী নিয়ে সেদেশে চলে যান। চার বছর ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চাকুরী করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৮৬ সালে গ্লাসগো রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে জেনারেল সার্জারিতে FRCS ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর অব সার্জারি এবং ল্যাপারোসকোপ (Laparoscope) যন্ত্রের দ্বারা পিত্ত-থলির পাথর (Gall Bladder Stone) অপারেশনে, একক হাতে (Single handed) করা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ সার্জন (Surgeon)।